The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXIV, 2018 (pp. 17 - 36)
Published in October, 2023

বেগম রোকেয়ার জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম

ড. জিনবোধি ভিক্ষু*

প্রতিপাদ্যসার

মানুষ মাত্রই আত্মসচেতন, বিবেকবান, বুদ্ধিদীপ্ত এবং ভালো-মন্দ, অনুভব ও অনুধাবন করার অন্যতম জীব। তাই কিছু কিছু শাস্ত্র গ্রন্থে বর্ণিত আছে- 'মানুষকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব', 'নররূপী নারায়ন' এবং দুর্লভ জীবন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ বলে বিভাজন করার কোনো সুযোগ নেই। নারী-পুরুষ সবাই মূলত মানবসন্তান। সৃজনশীল মেধা, দূরদৃষ্টি, প্রত্যুৎপন্নমতিতা বা উপস্থিত বুদ্ধি, দূরদৃষ্টি, ধৈর্য্য, ক্ষমা-চেতনা, সহিষ্ণুতা এবং জ্ঞানান্বেষী মানসিকতা যাঁর মধ্যে বিরাজমান তিনি নারী হোক বা পুরুষ হোক অবশ্যই আলোকিত ও মহিমান্বিত জীবন লাভে ধন্য হন। এই বিদুষী মহিলা বেগম রোকেয়ার জীবন দর্শন ও সাহিত্যকর্মের অনুধ্যান ও অনুধাবন করলে স্পষ্ট ভাষায় বলা যায়, তাঁর মধ্যে বহুমুখী প্রতিভার স্ফূরণ ছিল অসাধারণ এবং অতুলনীয়। দুর্ভাগ্য তিনি যে সময়ে যে সমাজে জন্মেছিলেন সেই সময়ে নারীদের আধুনিক শিক্ষা লাভের তেমন কোনো সুযোগ-সুবিধা ছিল না বললেও কম বলা হবে। তিনি তাঁর নিজস্ব মুক্ত চিন্তা-চেতনা, দৃঢ়তা, সাহসী ও জ্ঞানান্বেষী মানসিকতা দিয়ে পরিবারের আলোকিত বরেণ্য সদস্যদের সাহচর্য্যে যুগোপযোগী শিক্ষা ও সৃজনশীল মেধা সঞ্চয়ের গভীর মননশীলতা ছিল অত্যন্ত আন্তরিক। তিনি তাঁর স্বীয় বহুমুখী প্রাজ্ঞতা গুণে তৎকালীন সময়ে পিছিয়ে পড়া নারী জাতির শিক্ষার জাগরণের ক্ষেত্রে যে ভূমিকা প্রতিকূল পরিবেশে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন তা অতীব বিরল। তাই তাঁকে 'বাংলার নারী জাগরণের অগ্রদূত' বললেও অত্যুক্তি হবে না। বিশ্বায়নের যুগে যে-কোনো মানুষের কর্মপ্রতিভার মূল্যায়ন, মর্যাদা এবং স্বীকৃতি দান বুদ্ধিদীপ্ত মানুষের অপরিহার্য কর্তব্য। বেগম রোকেয়া এমন একজন আলোকিত ও বিদুষী নারী যাঁর শিক্ষার উন্মেষের পাশাপাশি বহুমুখী সাহিত্য প্রতিভা ছিল বিস্ময়কর। তাঁর এই অসামান্য প্রতিভা, কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন এবং প্রজন্মের চেতনাকে জাগ্রত করার জন্য এই নিবন্ধের প্রয়াস।

* অধ্যাপক, পালি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকাঃ

"আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে? কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে
মুখে হাসি বুকে বল তেজে ভরা মন 'মানুষ হইতেই হবে' এই তার পণ"

'রূপসি বাংলার কবি' জীবনানন্দ দাসের রত্নগর্ভা মা কুসুমকুমারী দাসের লেখা ঐ অনবদ্য চরণসমূহের সার্থক প্রকাশ দেখতে পাই বাঙালি মুসলিম নারী-মুক্তির অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের জীবনদর্শনে। বাঙালি মুসলিম নারী প্রগতির ক্ষেত্রে তাঁর বলিষ্ঠ ও অনবদ্য ভূমিকা নিঃসন্দেহে বিশাল। ভারতের হিন্দু নারীর সামাজিক ও মানবিক অধিকার আন্দোলনে রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অনন্য ও নির্ভীক ঐতিহাসিক ভূমিকার সাথে তুলনীয়। তিনি ছিলেন বাঙালি মুসলিম নারী-মুক্তির অগ্রদূত। অসাধারণ প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব বলে যুগ যুগ ধরে নিপীড়িত ও নির্যাতিত পিছিয়ে পড়া বাঙালি মুসলিম নারী সমাজকে তিনি দিয়েছিলেন আলোর সন্ধান, দেখিয়েছিলেন মুক্তির পথ। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বাঙালি মুসলিম সমাজে বেগম রোকেয়া সর্বপ্রথম পুরুষের সাথে নারীর সমধিকার দাবি নারীমুক্তি আন্দোলনের সূচনা করেন। সমাজে প্রচলিত নানাবিধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধেও তীব্র ও সোচ্চার কণ্ঠে প্রতিবাদ করেন। নারী-মুক্তি অর্জনের জন্য নারী-শিক্ষার ব্যাপক প্রসার নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি ও নারীকে অবরোধবাসিনী করে রাখার প্রথায় মূলোচ্ছেদ-এই তিনটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হতে আমরণ তিনি আন্দোলন ও সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন। এছাড়াও মুসলিম নারীদের একতাবদ্ধ করে সমাজে তাদের নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং দেশ ও জাতি সম্পর্কে সচেতনতাবোধ জাগ্রত করার লক্ষ্যে নারীদেরকে নিয়ে নারী সংগঠন স্থাপনেও তিনি অগ্রগামী ছিলেন। লেখক, শিক্ষাবিদ ও সমাজকর্মী হিসেবে বেগম রোকেয়ার লক্ষ্য ছিল উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে নারীরা মানসিক দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করে সমাজে একক ব্যক্তিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করুক। এটাই তাঁর মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে ছিল।

এ মহিয়সী নারীকে বলা যায় তীব্র গভীর নিশিতে ঘন জমাট কাদম্বনীতে ঢাকা জমা গগনে হঠাৎ করে চন্দ্র শশির আলোয় সমগ্র ধরণী জেগে ওঠার গানে জ্যোৎস্নায় জেগে উঠে, বেগম রোকেয়া ছিলেন অন্ধকারে ঢাকা বাঙালির গভীর নিশিথে আলোসম। বর্তমান নিবন্ধে তাঁর জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে সম্যক ধারণা উপস্থাপন করা হয়েছে।

মানুষ প্রতিভা নিয়ে না জন্মালেও বহুমুখী প্রতিভা মানুষের জীবনে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। নিজস্ব মনন শক্তি, জ্ঞানান্বেষী চেতনা এবং গভীর অধ্যবসায় বিদ্যমান থাকলে সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ সময় সাপেক্ষ জাগরণ সহজ হয়। মাতৃজাতির আলোকিত নারী বেগম রোকেয়ার জীবন ও সাহিত্যকর্ম এর জ্বলন্ত প্রমাণ যা প্রজন্মের চেতনাকে শাণিত করবে যুগে যুগে।

বেগম রোকেয়ার জন্ম

মানবজন্ম মাত্রই অতি দুর্লভ এবং মূল্যবান। এর চেয়ে বড় দুর্লভ মানবতা ও মনুষ্যত্ব জ্ঞান অর্জন করা। আসামের বঙ্গভূমি স্মরণাতীতকাল থেকে শিক্ষা ও সংস্কৃতিচর্চার প্রাণকেন্দ্ররূপে প্রতিভাত। পশ্চিমা দেশে যখন শিক্ষার আলো ছিল না তখন এ ঐতিহ্যমণ্ডিত ভারত ও বঙ্গদেশে বহু বিদ্যাপীঠ (পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, বিক্রমশীলা, পণ্ডিত বিহার, শালবন বিহার) গড়ে উঠেছিল। বেগম রোকেয়ার জন্মকাল ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে। ১৮৮০ সালের ৯ই ডিসেম্বর অবিভক্ত ভারতের পূর্ববঙ্গের ঐতিহ্যবাহী রংপুর জেলার মিঠাপুকুর থানার অন্তর্গত পায়রাবন্দ গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষানুরাগী মুসলিম জমিদার পরিবারে বেগম রোকেয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বিশিষ্ট সমাজসেবক এবং জননন্দিত জহীরুদ্দীন মোহাম্মদ আবু আলী হায়দার সাবের (মৃত্যু-১৯১৩) এবং মাতা পতিব্রতা, অতিথি-পরায়ণা এবং ধর্মপরায়না রাহাতুন্নেসা সাবেরা চৌধুরানী (মৃত্যু-১৯১২)। তাঁরা দু'ভাই এবং তিন বোন। মোহাম্মদ ইব্রাহীম আবুল আসাদ সাবের ও খলিলুর রহমান

হায়দার সাবের এবং বোনদের মধ্যে করিমুন্নেসা খানম (১৮৫৫-১৯২৬), বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২) ও হোমায়রা চৌধুরী। করিমুন্নেসার দুই দেশবিখ্যাত পুত্র স্যার আবদুল করিম গজনভী (১৮৭২-১৯৩৯) ও স্যার আবদুল হালিম গজনভী (১৮৭৯-১৯৫৬)। বেগম রোকেয়া ভাই ও বোনদের মধ্যে কনিষ্ঠ সন্তান। বেগম রোকেয়ার পূর্বপুরুষগণ মোগল আমলে উচ্চ সামরিক এবং বিচার বিভাগীয় পদে নিয়োজিত ছিলেন। পিতা তৎকালীন সময়ে উর্দু, ফারসি, বাংলা, হিন্দি এবং ইংরেজি ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। ভাই দু'জন বাল্যকালে পড়ালেখার প্রতি গভীর অনুরাগী ছিলেন। তাঁরা কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে অধ্যয়ন করেন। ফলে ইংরেজি শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আধুনিক মুক্তবুদ্ধি ও স্বাধীনচেতা উন্নত মানসিকতার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ঘটেছিল। জ্ঞানান্বেষী ও দৃঢ়চেতা বেগম রোকেয়ার বড় বোন করিমুন্নেসা ছিলেন অত্যন্ত বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যনুরাগী। তাঁর প্রভাব অনেকটা প্রভাবিত বেগম রোকেয়ার রক্ত ধমণীতে প্রবাহমান বলা যায়। বিদ্যোৎসাহী পিতা, ভ্রাতৃদ্বয় এবং অগ্রজ-বোনের বহুমুখী জ্ঞানপ্রভাব অনেকটা পারিবারিকসূত্রে প্রাপ্ত বলা যায়। এছাড়া ধর্মীয় অনুরাগ এবং আধুনিক শিক্ষার প্রতি গভীর আগ্রহ ও শ্রদ্ধাবোধ রোকেয়ার জীবনে বাল্যকাল থেকে জন্মেছিল।

শিক্ষাজীবন

পিতা জহীরুদ্দিন মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে ছিলেন রক্ষণশীল। কিন্তু দু'ছেলেকে আধুনিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত করেছেন। তারা প্রাথমিক, মাধ্যমিক শিক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতায় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পাঠ গ্রহণ করেন। তাদের জ্ঞান প্রতিভার স্পৃহা দেখে কলেজের অধ্যাপকগণ মুগ্ধ ছিলেন। অগ্রজ ভ্রাতৃদ্বয়ের শিক্ষার অগ্রগতি ও সৃজন মেধার পরিচয় পেয়ে বোন করিমুন্নেসার জীবনে সেই জ্ঞানের আলোকচ্ছটা অনেকটা জাগ্রত হয়েছিল। সামাজিক প্রতিবন্ধকতার কারণে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ না পেলেও ভ্রাতৃদ্বয়ের আন্তরিক সহায়তায় তিনি বাড়িতে পড়ালেখার সুযোগ লাভ করেন। পারিবারিক শিক্ষায় অগ্রগতি কনিষ্ঠ বোন বেগম রোকেয়ার কোমল অন্তরে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল।

দু'ভাই এবং অগ্রজ বোনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হওয়ার দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করেন তিনি। তাঁর বয়স যখন মাত্র পাঁচ বছর। তখন মায়ের সঙ্গে কলকাতায় থাকাকালীন একজন মেম শিক্ষয়িত্রীর কাছে কিছুদিন ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে পড়ালেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। শিক্ষানুরাগী বেগম রোকেয়ার ঐকান্তিক অধ্যবসায়, মেধা, গুরুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও স্মরণশক্তিগুণে তিনি যা যা পাঠ গ্রহণ করেছিলেন তাতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তাঁর বড় ভাই ও বোনের আন্তরিক সহযোগিতায় বেগম রোকেয়া বাংলা ও ইংরেজি দুই ভাষা সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তাতে তিনি উভয় ভাষায় পড়ালেখা করে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেন।

দুর্ভাগ্য যে, তৎকালীন সময়ে বেগম রোকেয়া যে সামাজিক পরিমণ্ডলে বেড়ে ওঠেন সেখানে মুসলিম মেয়েদের গৃহের অর্গলমুক্ত বা অঙ্গনমুক্ত হয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের কোনো সুযোগ ছিল না। সামান্য যে সুযোগ ছিল তাও সমাজ ও আত্মীয় স্বজনদের ভ্রুকুটির বিরূপ সমালোচনার মুখে বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। এমন একদিন ছিল যেদিন বাংলার মুসলিম নারীদের ঘরের চতুষ্কোণের মধ্যেই আটক থাকতে হতো। বাংলা ও ইংরেজি শিক্ষা-দীক্ষা ছিল নারীদের জন্যে পাপের কাজ। ১৮৯৮ সালে বেগম রোকেয়া বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর বিদ্যোৎসাহী স্বামী সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের উৎসাহ ও সহযোগিতায় জ্ঞানচর্চার পরিধি আরো বহুগুণে বিস্তৃত হয়। তখন তিনি স্বামীর আন্তরিক সহায়তায় দেশি-বিদেশি লেখকদের রচনার সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিতি এবং ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। সেদিক থেকে তাঁর জ্ঞানচর্চার ও সাহিত্যচর্চার গভীর পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট বলা যায় যে, তিনি পিতা ও ভাইবোনদের ন্যায় বহু ভাষায় বিশেষ

ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। বলা যায়, বাল্যকাল থেকে আরবি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা, উর্দু, হিন্দি ও ইংরেজি ভাষায়ও তাঁর যথেষ্ট পারঙ্গমতা অর্জিত হয়েছিল।

দেহের অবয়ব

মানবজীবন সকল দিক থেকে সৃষ্ঠির শ্রেষ্ঠ জীবন। এ মানবজীবনে নারী-পুরুষ নামে আলাদা বিভাজন থাকলেও পরস্পরের সমন্বয়ের মাধ্যমে মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশ এতে বিন্দুমাত্র দ্বিমত নেই। তাই নারী-পুরুষের চেয়েও আমার-আপনার বড় পরিচয় হলো আমরা মানবসন্তান। এর মধ্যে কোনো বিভাজন নেই। তাই একেকজনের দেহের গঠন ও অবয়ব একেক রকম। বেগম রোকেয়া দেহের গঠন ছিল অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত, সুঠাম, সুস্বাস্থ্য, পূর্ণাঙ্গ চেহারার অধিকারী বেগম রোকেয়া আকর্ষণীয় পরীর মতো রূপলাব্যণে ভরপুর ছিল। বলা যায়, সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ একজন মানবী। এক কথায়- দেবীতুল্য চেহারা জন্ম-জন্মান্তরের অসীম পুণ্যকর্মের প্রভাবে সর্বগুণ লক্ষণসম্পন্ন মনোমুগ্ধকর নারী। মিষ্টি মুখ এবং সদা-সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল ভাব খুবই কম দেখা যায়। নারী হয়েও মাতৃত্বগুণের মহিমা ছিল অপার ও অতুলনীয়। উচ্চতার দিক থেকে ত্রুটিমুক্ত। ৫২ বছর বয়সেও দেখতে ভরা যৌবনের মতো মনে হয়। সার্থক ও পরিপূর্ণ নারী।

বিবাহিত জীবন

বংশমর্যাদা ও পারিবারিক মর্যাদাকে সমুন্নত করার জন্য নারী হোক বা পুরুষ হোক তাদেরকে বয়স ও যোগ্যতা অনুসারে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ করা হয়। এখানে বিবাহিত জীবন বলতে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ জীবনকে বোঝানো হয়েছে। সামাজিক ও ধর্মীয় রীতি-নিয়মানুসারে বিবাহিত জীবনের স্বীকৃতি রয়েছে। বেগম রোকেয়া মাত্র ১৮ বছর বয়সে ১৮৯৮ সালে ভারতের বিহার রাজ্যের ভাগলপুর নিবাসী উর্দুভাষী সৈয়দ সাখাওয়াৎ হোসেনের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন । তিনি স্ত্রীর আধুনিক শিক্ষার প্রতি প্রবল আগ্রহ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। সৌভাগ্য যে, স্বামী তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের অধীনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদমর্যাদায় সমাসীন ছিলেন। তিনি ছিলেন সৃজনশীল মেধার অধিকারী, মুক্তমনা, সমাজ সচেতনতা, ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারমুক্ত এবং প্রগতিশীল উদার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন। এককথায়, স্বামী ছিলেন অতিশয় উদার হৃদয় এবং বাস্তববাদী মানুষ।

তাই তিনি সহধর্মিণী রোকেয়াকে যুগোপযোগী বিদ্যাচর্চা কোনো রকমের বাঁধা দেননি, বরং তাঁকে বিদ্যার্জনে ও বিদ্যাচর্চায় আন্তরিক সহানুভূতি দিয়েছিলেন। এখানেই স্বামীর মহত্ত্ব ও বিদ্যোৎসাহিতার পরিচয় মেলে। বলা যায়, স্বামীর উৎসাহ ও সহযোগিতায় জ্ঞানান্বেষী রোকেয়া দেশি-বিদেশি খ্যাতিমান লেখকদের শিক্ষণীয় ও অনুকরণীয় রচনাবলির সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেন। তিনি নিত্য-নতুন গভীর জ্ঞান সাধনার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে দক্ষতা অর্জন করেন। তাঁর সাহিত্যচর্চার সূত্রপাতও ঘটেছিল শিক্ষানুরাগী স্বামীর অনুপ্রেরণা ও আন্তরিক সহযোগিতায়। তাঁদের বৈবাহিক জীবনে সংসারের সাদামাটা স্বামী-স্ত্রী শুধু নন তাদের পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্বভাব এবং কল্যাণমিত্রের ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। তাঁদের আনন্দময় সুখের সংসারে দু'টি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়েছিল। মর্মান্তিক ও করুণ ঘটনা হলো দু'টি কন্যা সন্তানই অকালে মারা যায়। একজন চারমাস বয়সে এবং অন্যজন পাঁচ মাস বয়সে (বেগম রোকেয়া, ২০০৫, ৪৭৭)। সংসার সুখের হলেও তাঁদের সংসার জীবন অতি দুঃখ-কষ্ট ও বেদনাদায়ক ছিল।

স্বামীর মৃত্যু

নারী হোক বা পুরুষ হোক সময়সাপেক্ষ উভয়ের জীবনে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। মৃত্যু মানবজীবনে স্বাভাবিক ধর্ম। বেগম রোকেয়ার বিবাহিত জীবন বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ১৮৯৮ সাল থেকে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত মাত্র ১১ বছর সংসার জীবনযাপন করে দুর্ভাগ্যবশত অল্প বয়সে তিনি স্বামীহারা হয়েছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২৯। এ বয়সে আলোকিত, উচ্চশিক্ষিত এবং উচ্চ সরকারি পদমর্যাদাসম্পন্ন স্বামীকে হারিয়ে কত যে অসহায় জীবনযাপন করতে হয় তা বলাই বাহুল্য। শুভানুধ্যায়ী স্বামীর মৃত্যুর পর বেগম রোকেয়া নিজেই কর্মজীবন বেছে নিয়েছিলেন। তখন থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং মুসলিম নারীদের জ্ঞানদান ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত। এই প্রসঙ্গে বলা যায়-

'মৃত্যু যন্ত্রণা কত জনে করেছে পেষণ,
হয়েছে ভূগর্ভে লীন যশস্বীরা কত?"

(ড. কামরুল আহসান, ৪৮১)।

কর্মজীবন

মানুষের জীবনমাত্রই কর্মময়। সৎকর্ম মানুষকে যুগে যুগে বাঁচিয়ে রাখে। যিনি বা যারা আন্তরিকতা, আত্মবিশ্বাস ও শ্রদ্ধাবোধ দিয়ে দেশ ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণে অবদান রাখেন তারাই হয় গ্রহণযোগ্য এবং গর্বিত ইতিহাসের অধ্যায়। মানবপ্রেমিক ও শিক্ষানুরাগী বেগম রোকেয়া দেশ ও জাতির স্বার্থে বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া নারী জাতিকে যুগোপযোগী শিক্ষার সুযোগ দানের জন্য যা অবদান রেখে গেছেন তা সকলের জ্ঞাতার্থে নিম্নে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

১৯০৯ : সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা, ভাগলপুর, বিহার। ১৬ই মার্চ, ১৯১১ : সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল কলকাতায় স্থানান্তরিত। ১৯১১ সালে অলিউল্লাহ লেনে, ১৯১৩ সালে ১৩ ইউরোপিয়ান অ্যাসাইলাম লেনে, ১৯১৫ সালে স্থায়ীভাবে ৮৬/এ লোয়ার সারকুলার রোডে। ১৯১৩ সালে স্কুল ম্যানেজিং কমিটি : ১ জাস্টিস সৈয়দ শরফুদ্দীন (সভাপতি) ; ২ নওয়াব সিরাজুল ইসলাম খানবাহাদুর ; ৩ জাস্টিস সৈয়দ হাসান ইমাম ; ৪ হাজী নূর মোহাম্মদ জাকারিয়া (ব্যবসায়ী) ; ৫ ব্যারিস্টার আবদুর রসুল ; ৬ ব্যারিস্টার সৈয়দ সুলতান আহমদ ; ৭ এ. এইচ. গজনভী (জমিদার); ৮ শেখ মাহবুব আলী ; ৯ মৌলভী এম. এস. আবদুর রব ; ১০ মৌলভী মুজিবর রহমান (সম্পাদক, 'দি মুসলমান') ; ১১ ওসমান জামাল (ব্যবসায়ী); ১২ সৈয়দ আহমদ আলী (অবৈতনিক সম্পাদক)। সার্বিক ব্যবস্থাপনা : মিসেস আর. এস. হোসেন। স্কুলটি এখনো সচল। বর্তমানে কলকাতার ৯ নম্বর লর্ড সিংহ রোডে অবস্থিত। ১৯১৩ : 'তুরস্ক সাহায্য ভাণ্ডারে' সহায়তার উদ্দেশ্যে পর্দানশিন মহিলাদের সভায় যোগদান ও সংক্ষিপ্ত ভাষণ। ১৯১৬ : 'আনজুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম' নামে মুসলিম মহিলা সংস্থা প্রতিষ্ঠা সম্পাদিকা : রোকেয়া। সভাপতি : মিসেস আবদুল করিম। এই সংস্থার লক্ষ্য মুসলিম মহিলাদের অবস্থার উন্নয়ন সাধন। স্কুল বিষয়ে সরোজিনী নাইডুর স্বতঃপ্রণোদিত উৎসাহপত্র পেলেন ১৯১৭: বড়লাটপত্নী লেডী চেমসফোর্ড-এর স্কুল পরিদর্শন। স্কুল বিষয়ে রোকেয়া সহায়তা পেয়েছেন আগা খান, মওলানা মোহাম্মদ আলী (তাঁর কন্যারা এই স্কুলের ছাত্রী), নওয়াব স্যার সৈয়দ শামসুল হুদা, সৈয়দ হাসান ইমাম, মিঃ আবদুর রসুল, স্যার আবদুর রহিম, স্যার এ. কে. গজনভী, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক প্রমুখের কাছ থেকে। এপ্রিল ১৯১৭ : 'আনজুমানে খাওয়াতীনে ইসলামে'র বার্ষিক সভা ৮৬/এ লোয়ার সারকুলার রোডে অনুষ্ঠিত। সম্পাদিকা হিসেবে রোকেয়া বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করলেন। উই এপ্রিল ১৯২০ : কলকাতার টাউন হলে 'শিশু পালন' প্রবন্ধ পাঠ। ১৯২৬ : *Bengal Women's Educational Conference*-এ (বঙ্গীয় নারী-শিক্ষা সম্মেলনের অধিবেশনে) সভানেত্রী। তাঁর অভিভাষণ

'সভানেত্রীর অভিভাষণ' নামে 'সাহিত্যিক' (ফাল্গুন ১৩৩৩), 'বঙ্গীয় নারী-শিক্ষা সমিতি' নামে *সওগাত* (চৈত্র ১৩৩৩) এবং 'অভিভাষণ' নামে *সবুজপত্র* (চৈত্র ১৩৩৩) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ৮ই মার্চ ১৯৩১ : 'ধ্বংসের পথে বঙ্গীয় মুসলিম' নামে তাঁর একটি অভিভাষণ রোকেয়ার স্কুল-সেক্রেটারি সৈয়দ আহমদ আলী-কর্তৃক পাঠ। পরে *মোহাম্মদী* (জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮) পত্রিকায় প্রকাশিত। ১৯৩২ : *নারীসম্মেলনে সভানেত্রী* (সৈয়দ আবদুল মান্নান, ১৮৮৩, ৯৯-১০০)।

নারী শিক্ষা বিস্তার ও স্বামীর নামে স্কুল প্রতিষ্ঠা

জ্ঞানশক্তি অসাধারণ শক্তি। পুরুষ হোক বা নারী হোক শিক্ষা মানুষের জীবনে অপরিহার্য সম্পদ। শিক্ষা ছাড়া মানুষের জীবনে কোনো মূল্য নেই। সভ্যতার ক্রমবিকাশ শিক্ষার মাধ্যমে সম্ভব। বেগম রোকেয়া তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। উচ্চশিক্ষিত এবং সরকারি উচ্চ পদমর্যাদাসম্পন্ন আলোকিত প্রিয় স্বামী সাখাওয়াৎ হোসেনের মৃত্যুর পরে নিঃসঙ্গ রোকেয়া নারী শিক্ষা বিস্তারে আত্মনিয়োগ করেন। ১ অক্টোবর ১৯০৯ সাল থেকে তাঁর জীবনে আরেকটি নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছিল। প্রিয়তমা স্বামীর রেখে যাওয়া দশ হাজার টাকাকে সম্বল করে শ্বশুরালয় ভাগলপুরে স্বামীর নামানুসারে প্রতিষ্ঠা করেন প্রথম স্কুল- "সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল"। অভিভাবকহারা বিধবা বেগম রোকেয়ার কর্মময় জীবনে স্কুল প্রতিষ্ঠা করা এক অনন্য কর্ম। অতঃপর তিনি মাত্র পাঁচ জন ছাত্রী নিয়ে ১৯০৯ সাল থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত অনেক ত্যাগ স্বীকার করেও দু'বছরের বেশি জ্ঞানদানের মতো পবিত্র কাজ দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। পারিপার্শ্বিক অনুকূল পরিবেশ না পেয়ে বিশেষ করে পারিবারিক কারণে রোকেয়া ভাগলপুর ছেড়ে কলকাতায় এসে বসবাস শুরু করেন। কলকাতার একটি ক্ষুদ্র গলিতে তিনি ছোট একটি ঘর নিয়ে বসবাস করেন। গ্রামের মেয়ের কলকাতায় বসবাস করা সহজ ছিল না বরং কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁকে। তখনও তিনি স্বামীর নামে স্কুল প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন থেকে দূরে সরে দাঁড়াননি। শিক্ষা সম্পর্কে বেগম রোকেয়ার মননশীল চিন্তা-ভাবনা কতটুকু গভীর এবং অর্ন্তদৃষ্টিসম্পন্ন ছিল নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা থেকে তার প্রকাশ পাই।

"শিক্ষার অর্থ কোনো সম্প্রদায় বা জাতিবিশেষের 'অন্ধ-অনুকরণ' নহে। ঈশ্বর যে স্বাভাবিক জ্ঞান বা ক্ষমতা দিয়েছেন, সেই ক্ষমতাকে অনুশীলন দ্বারা বৃদ্ধি করাই শিক্ষা। ঐ গুণের সদ্ব্যবহার করা কর্তব্য এবং অপব্যবহার করা দোষ" (বেগম রোকেয়া, স্ত্রীজাতির অবনতি, মতিচূর, ১ম খণ্ড, ২৮-২৯)। তিনি শিক্ষার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে আরও বলেছেন- "টাকা উপার্জন করাই যে শিক্ষালাভের মূল উদ্দেশ্য ইহা আমি কোনো কালেই স্বীকার করি নাই। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যে মানুষকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তোলা। আবার কেবল বি.এ. এম. এ. পাস করিলেও অনেক স্থলে প্রকৃত শিক্ষা হয় না। লেখাপড়া পরীক্ষা পাশের জন্য না হইয়া জ্ঞানলাভের জন্য হওয়া উচিত" (*রোকেয়া জীবনী*, ৪৬)।

কলকাতায় স্কুল প্রতিষ্ঠা

মানুষ হিসেবে মানুষের মহৎ উদ্দেশ্য অন্তরে বিদ্যমান থাকলে একদিন না একদিন তার স্বপ্ন পূরণ হবেই। বিদ্যোৎসাহী বেগম রোকেয়ার জীবনেও অনেকটা তাই হয়েছিল। তৎকালীন ভারতের রাজধানী কলকাতার বুকে এসে ১৯১১ সালের ১৬ মার্চ কলকাতার ১৩ ওয়ালিউল্লাহ লেনে একটি বাড়িতে মাত্র আট জন ছাত্রী নিয়ে তিনি নবপর্যায়ে 'সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন ঐ স্কুলের পরিচালিকা ও শিক্ষয়িত্রী। তাঁর সুদক্ষ পরিচালনায় সবদিক দিয়েই স্কুলের উন্নতি ও সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। বেগম রোকেয়ার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ১৯১৭ সালে স্কুলটি মধ্য ইংরেজি গার্লস স্কুলে এবং ১৯৩১ সালে উচ্চ ইংরেজি গার্লস স্কুলে রূপান্তরিত হয়। ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ও প্রাতিষ্ঠানিক কারণসহ অন্যান্য কারণে স্কুলটিতে বহুবার স্থান বদল করতে হয়েছিল। কিন্তু নানা বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও স্কুল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রোকেয়া

পিছপা হননি কোনোদিন। বিভিন্ন সময় স্কুলটির অবস্থান ছিল ১৩, ইউরোপীয়ান অ্যাসাইলাম লেন (১৯১৩), ১৬২, লোয়ার সার্কুলার রোড (১৯৩২), ১৭, লর্ড সিনহা রোড (১৯৩৮) এবং আলীপুর হেস্টিংস হাউস (১৯৩৮)। ১৯৬৮ সালে এটি ১৭ নং লর্ড সিনহা রোডের নিজস্ব বাড়িতে স্থায়ীভাবে স্কুলটি স্থানান্তরিত হয়।

প্রায় দুই যুগ ধরে বেগম রোকেয়া তাঁর সর্বশক্তি প্রয়োগ করেন স্কুল পরিচালনায়। বিরূপ সমালোচনা ও নানাবিধ সামাজিক প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে তিনি এই প্রতিষ্ঠানটিকে সে যুগের মুসলমান মেয়েদের শিক্ষালাভের অন্যতম পীঠস্থানে পরিণত করেন। এটি ছিল তাঁর স্বপ্ন ও আদর্শের বাস্তবায়ন। শৈশব থেকে মুসলমান নারীদের যে দুর্দশা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করাই ছিল এই স্কুল প্রতিষ্ঠার অন্যতম লক্ষ্য। তাঁর স্কুলে মেয়েদের পাঠাবার জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে তিনি অভিভাবকদের অনুরোধ করতেন। যে যুগে কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামির কারণে বাঙালি মুসলমানরা মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার ব্যাপারে বিধিনিষেধ আরোপ করত, সেই অন্ধকার যুগে বেগম রোকেয়া পর্দার অন্তরালে থেকেই নারীশিক্ষা বিস্তারে প্রয়াসী হন এবং মুসলমান মেয়েদের অবরুদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্তিলাভের পথ সুগম করেন। প্রথমদিকে কেবল অবাঙালি ছাত্রীরাই পড়ত সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলে। বেগম রোকেয়ার অনুপ্রেরণায় ক্রমশ বাঙালি মেয়েরাও এগিয়ে আসে পড়াশোনার জন্য। ছাত্রীদের পর্দার ভিতর দিয়েই ঘোড়ার গাড়িতে করে স্কুলে আনা নেওয়া করা হতো।

সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলে তফসিরসহ কুরআন পাঠ থেকে আরম্ভ করে বাংলা, ইংরেজি, উর্দু, ফারসি, হোম নার্সিং, ফার্স্ট এইড, রান্না, সেলাই, শরীরচর্চা, সংগীত প্রভৃতি বিষয়ই শিক্ষা দেওয়া হতো। স্কুল পরিচালনা এবং পাঠদানে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য বেগম রোকেয়া বিভিন্ন বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করতেন। পর্যবেক্ষণ করতেন সেসব স্কুলের পাঠদান পদ্ধতি। এ ক্ষেত্রে তিনি কলকাতার শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ ইংরেজ, বাঙালি, ব্রাহ্ম, খ্রিষ্টান সব শ্রেণির নারীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন এবং তাঁদের আন্তরিক সহযোগিতা লাভ করেন। তিনি নিজেই স্কুলের শিক্ষিকাদের ট্রেনিং দিতেন। কলকাতায় উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী না পাওয়ায় রোকেয়া মাদ্রাজ, গয়া, আগ্রা প্রভৃতি স্থান থেকে দক্ষ শিক্ষয়িত্রী নিয়ে আসেন। তাঁর বারংবার আবেদনের ফলেই ১৯১৯ সালে সরকার কলকাতায় 'মুসলিম নারী ট্রেনিং স্কুল' স্থাপন করে। স্কুলের জন্য সরকারি সাহায্য এবং সামাজিক পৃষ্ঠপোষকতা আদায় ছিল বেগম রোকেয়ার জন্য এক কঠিন চ্যালেঞ্জ। এ কাজেও সামাজিক বিরুদ্ধতা আর কঠিন সমালোচনাকে উপেক্ষা করে তিনি সফলতা লাভ করেন। উপরোক্ত স্কুলসমূহ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করতে গিয়ে নানাভাবে তাঁকে কষ্ট করতে ও ধৈর্য ধরতে হয়েছে; বিশেষ করে অর্থনৈতিকভাবে সংকটে পড়তে হয়েছে তাঁর একটি লেখা চিঠি থেকে এ ব্যাপারে প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন, 'আমার স্নেহের মনা, তোমার প্রেরিত কাসন্দ পেয়ে সুখী হয়েছি। বুয়া! তুমি কাসন্দ না দিয়ে যদি স্কুল ফান্ডে পাঁচটা টাকা পাঠাতে তা'তে আমি খুশী হুতুম। এক ব্যক্তি সূদূর রেঙ্গুন থেকে স্কুলের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করে পাঠাচ্ছেন- গত মাসে ২৭ টাকা পাঠিয়েছিলেন, এবার ৬৯ টাকা ৬ আনা পাঠিয়েছেন। আর তোমরা আমার আপন লোক হয়ে স্কুলটাকে ভুলে থাক। ---- এই সঙ্গে স্কুলের একখানা রির্পোট পাঠাই। তোমার স্নেহের আপা, রোকেয়া, (২১/০৫/১৯২৯, *রোকেয়া রচনাবলী* ২০০৬, ৫১২)। এই প্রসঙ্গে আরেকটি লেখা চিঠি খুবই প্রাসঙ্গিক বলে এখানে তুলে ধরা সমীচীন মনে করি:

স্নেহাস্পদা মরিয়ম

Sakhawat Memorial Girls' School 86-A, Lower Circular Road, 8th Sept, 1915.

তোমার ১৯শে আগস্টের প্রাণ জুড়ানো চিঠিখানা পাইয়া পরম সুখী হইয়াছি। আমার মত জ্বলাপোড়া মরুভূমি তোমার মধুর স্নেহের যোগ্য নহে। তাই দেখ না, তোমার সরস চিঠিখানা মরুভূমি একেবারে শুষিয়াই লইয়াছিল।

চিঠি না লিখিবার একমাত্র কারণ সময়াভাব। বুঝিতেই পার এখন খোদার ফজলে পাঁচটি ক্লাস এবং ৭০টি ছোট-বড় মেয়ে, দু'খানা গাড়ী, দুই জোড়া ঘোড়া, সস, কোচম্যান ইত্যাদি-ইত্যাদি সব দিকে একা আমাকেই দৃষ্টি রাখিতে হয়। রোজ সন্ধ্যাবেলা সইসেরা ঠিকমত ঘোড়া মলে কি না তাও আমাকে দেখিতে হয়। ভগিনীরে! এই যে হাড়ভাঙ্গা গাধার খাটুনী ইহার বিনিময় কি, জানিস? বিনিময় হইতেছে "ভাঁড় লিপকে হাত কালা" অর্থাৎ উনুন লেপন করিলে উনুন তো বেশ পরিষ্কার হয়, কিন্তু যে লেপন করে তাহারই হাত কালিতে কালো হইয়া যায়। আমার হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পরিবর্তে সমাজ বিস্ফারিত নেত্রে আমার খুঁটিনাটি ভুল ভ্রান্তির ছিদ্র অন্বেষণ করিতেই বদ্ধপরিকর। কচি মেয়েরা মা-বাপের কাছে নিজেদের বুদ্ধিমত যাহা বোঝে, তাহাই বলে। তাহা নিয়া একটু রঙ্গ হয়। এইরূপ সুখে দুঃখে একরকম চলিয়াছে ভালই। আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষা কেয়ামতের পর দিন দেওয়া হইবে। এখন পড়া তৈরী করিতেছি (*বেগম রোকেয়া রচনা সমগ্র*, ৫৪৩)।

তোমার স্নেহের ভগিনী
রোকেয়া।

খান বাহাদুর তসদ্দক আহমেদকে লেখা চিঠি

ভাই সাহেব,

স্কুলের নানা জটিল কাজকর্মে এত ব্যস্ত থাকি যে, নিজের বাড়ীঘর, বিষয় সম্পত্তির দিকে মোটেই খেয়াল করতে পারি না। ফলে আমার প্রায় দশ হাজার টাকা লোকসান হয়ে গেল। এতটা লোকসান দেওয়া আমার জন্য কতই মারাত্মক। আমার স্বাস্থ্যও দিন দিন ভেঙ্গে পড়ছে। স্কুলের পুরো কাজ ছাড়া অন্যান্য সমিতির কিছু কিছু কাজও আমাকে করতে হয়। তাঁরা আমার কোন আপত্তি শুনবে না। আমার অসুস্থতার ওজর মানবে না। কাজেই আমার, ছাড়া পাবার উপায় নেই (৩০/০৯/১৯৩২, ভূমিকা, ড. কামরুল আহসান, ২০১৬, ৫৫৬)।

সংগঠন প্রতিষ্ঠা

তিনি স্কুল পরিচালনা করতে গিয়ে মর্মে মর্মে বুঝতে পেরেছিলেন একক শক্তি দিয়ে বড় ধরনের কাজ করা কঠিন বিষয়। বহুজনের শক্তিকে এক করতে পারলে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ভালো কিছু করা সম্ভব। তিনি এ চেতনাকে সামনে রেখে ১৯১৬ সালে একটি 'মুসলিম নারী সমিতি' নামে একটি সংগঠন করেন। এর নাম দিয়েছিলেন-আঞ্জুমান-ই-খাওয়া-তীন-ই-ইসলাম'। এ সংগঠনের মাধ্যমে তিনি একদিকে সাহসী পদক্ষেপ অন্যদিকে নানাভাবে সমাজসেবামূলক কার্যক্রমকে গতিশীল করে তুলেছিলেন। সাংগঠনিক নেতৃত্বদানকারীদের মধ্যে আন্তরিকতা, আত্মবিশ্বাস, শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত হলে সমাজ উন্নয়ন ও সেবামূলক কাজকর্মে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা অসম্ভব কিছু না। এর উজ্জ্বল দৃষ্ঠান্ত বেগম রোকেয়া প্রতিষ্টা করেন। এভাবে তিনি নারী জাগরণকে ত্বরান্বিত করেছিলেন। পুরুষ শাসিত সমাজ এবং ধর্মান্ধ প্রেক্ষাপট নারীদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে সমাজ সংস্কারমূলক অবদান রাখা অতি দুরূহ কাজ বললেও কম বলা হবে। তিনি বাল্যকাল থেকে অত্যন্ত দৃঢ়চেতা এবং যা করবেন বলে একবার মুখ থেকে বের করেছেন তা শেষ না করা অবধি পিছপা হতেন না। এভাবে তিনি প্রতিটি কাজে সফল হয়েছিলেন। তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার অন্যতম ক্ষেত্র এই নারী সমিতি। এ সমিতির প্রতিষ্ঠার ইতিহাসের সঙ্গে বেগম রোকেয়ার সংগ্রামী কর্মজীবনের কাহিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মুসলিম নারী সমিতি থেকে বহু বিধবা নারী অর্থ সাহায্য পেয়েছে, বহু দরিদ্র মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা হয়েছে, অসংখ্য অভাবী মেয়ে সমিতির অর্থে শিক্ষালাভ করেছে, সমাজে

পরিত্যক্ত, অসহায়, অনাথ শিশুরা আশ্রয় ও সাহায্য পেয়েছে। শুধু তাই নয়, কলকাতার মুসলমান নারী সমাজের ক্রমোন্নতির ইতিহাসে এই সমিতির উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল।

লোকচক্ষুর অন্তরালে এই সমিতি মুসলমান নারীদের কল্যাণে বিভিন্ন সেবামূলক কাজ করেছে। এ সমিতিতে যোগদানের জন্য রোকেয়াকে নানা অপবাদ মাথা পেতে নিয়ে ঘরে ঘরে গিয়ে নারীদের অনুপ্রাণিত করতে হয়েছে। এই সমিতি ভারতবর্ষের শাসন সংস্কারেও নারীর রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে মতামত তুলে ধরে। নারীদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য এই সমিতি শিল্প প্রতিষ্ঠানও স্থাপন করে। নারীর শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় বেগম রোকেয়ার নেতৃত্বে 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম' সে যুগে এক বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করে। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের নারী আন্দোলনে যেসব নারী নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাঁদের অনেকেই বেগম রোকেয়ার স্কুলে পড়াশোনা করেন এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভ করে তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। বেগম রোকেয়ার জীবনব্যাপী সাধনার অন্যতম ক্ষেত্র ছিল এই সমিতি।

নারী সম্মেলনে যোগদান

যে-কোনো মানুষের প্রতিভা ও কর্মদক্ষতা গুণ বিদ্যমান থাকলে তাঁকে কোনোভাবে চেপে রাখা যায় না। এটাই বাস্তবতা। হীরকখণ্ড দুর্লভ এবং মূল্যও বেশি। কিন্তু তা গভীর গর্তে পুঁতে রাখলে এর গুণাগুণ বুঝা যায় না। বুদ্ধিমান, জ্ঞানী এবং অভিজ্ঞ মানুষ তা মাটি থেকে পুনরুদ্ধার করে ঘষামাজা করলে তা থেকে দ্যুতি বের হয়। দুর্লভ হীরকখণ্ডতুল্য বেগম রোকেয়ার জীবনাদর্শ অনেকটা তাই বলা যায়। ১৯২৬ সালের কলকাতায় অনুষ্ঠিত বাংলার নারী শিক্ষা বিষয়ক সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করার গৌরব অর্জন করেন। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো রকমের ডিগ্রি না থাকা সত্ত্বেও স্বীয় অসাধারণ প্রতিভাগুণে মানুষ কত বড় হতে পারে তাঁর জীবনই একমাত্র অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। ১৯৩০ সালে বঙ্গীয় মুসলিম সম্মেলনে রোকেয়া 'বাংলা ভাষার' পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন, যা সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে ছিলো দুঃসাহসিক কাজ। জাতীয় কবি নজরুলের ভাষায় গর্ব করে বলতে হয়-

"বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর"
–(নারী, কাজী নজরুল ইসলাম)

নারী জাগরণ

" কোনকালে একা হয়নিকো, জয়ী পুরুষের তরবারি
প্রেরণা দিয়েছে, শক্তি দিয়েছে,বিজয় লক্ষ্মী নারী"।
–(নারী, কাজী নজরুল ইসলাম)

অভূতপূর্ব কাব্যিক ছন্দের এই প্রতিধ্বনি বিদুষী নারী বেগম রোকেয়া'র জীবন আদর্শে বাস্তব রূপ দেখতে পাই।

পুরুষেরা যেমন মানুষ, নারীরাও একই অর্থে মানুষ। দেহের গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে পুরুষ ও নারী আলাদা করা হয়েছে। কিন্তু রক্তের দিক থেকে উভয়ে এক। তাই পুরুষ ও নারী বিভাজন করার কোনো সুযোগ নেই। বরং যুগে যুগে একে অপরের পরিপূরক, সহায়ক এবং অভিন্ন। একজনকে বাদ দিয়ে অন্যজনের আশা-প্রত্যাশা পূরণ কোনোভাবে হয় না।

তাই দু'জনের সমন্বয়ে নতুনত্বের সৃষ্টি। বিশ্বের কোনো ধর্মীয় শাস্ত্রে নারী জাগরণ বিষয়ে কোনো বাধার কথা নেই। বলা যায়, নারীরাও সমান সুযোগ সুবিধা ও মর্যাদা নিয়ে বসবাস করার বিষয় স্বগৌরবে উল্লেখিত আছে।

ইসলাম ধর্মে নারী সমাজের প্রতি উদারতা, ন্যায়বিচার এক সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। নারীর অধিকার রক্ষা, ধর্মচর্চা ও ধর্মদর্শনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কুরআনভিত্তিক সমাজে জ্ঞানার্জন নারী কিংবা পুরুষ কোনো এক সম্প্রদায়ের জন্য সীমিত থাকতে পারে না। ইসলামের শেষ পয়গম্বর প্রত্যেক নর-নারীর জন্য শিক্ষাকে অবশ্য কর্তব্য বলে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু এদেশে এ শিক্ষার বাস্তব চিত্র ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। অশিক্ষা, কুশিক্ষা, গোঁড়ামি, কুসংস্কার আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছিল মুসলমান সমাজকে। মুসলমান নারীর জীবনব্যবস্থা এমনই করুণ ও দুর্বিষহ পর্যায়ে চলে গিয়েছিল যে, তাঁরা জানতেনই না ইসলাম কত মর্যাদাময় আসনে তাঁদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। এ নিছিদ্র অন্ধকারে দমবন্ধ পরিবেশে রোকেয়া এনেছিলেন খোলা হাওয়ার পরশ। কাঁপন ধরিয়েছিলেন অচলায়তনে। অচেতন নারীর মধ্যে অধিকারবোধ জাগানোর দায়িত্ব নিয়েছিলেন, তাদের শিক্ষার আলোকে অবগাহন করানোর ব্রত গ্রহণ করেছিলেন, আত্মমর্যাদা জাগরণের প্রেরণা হয়েছিলেন।

বেগম রোকেয়া বুঝেছিলেন, শতকরা ১০০ জন অশিক্ষিত মুসলিম নারীর মধ্যে জাগ্রত ভাব আনাতে হলে এঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, 'আপনারা বিবেচনা করে দেখুন, হযরত মোহাম্মদ (সা.) তেরশত বৎসর পূর্বে শিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে কী বলেছিলেন- 'বিদ্যা শিক্ষা কর, যে বিদ্যা- শিক্ষা করে সে নির্মল চরিত্রের অধিকারী হয়, যে বিদ্যা চর্চা করে সে আমার স্তব করে, যে বিদ্যা অন্বেষণ করে সে উপাসনা করে। ... বন্ধু সভায় বিদ্যা অলংকার স্বরূপ, শত্রু সম্মুখে অস্ত্র স্বরূপ।' ... যাঁহারা মোহাম্মদের (সা.) নামে প্রাণদানে প্রস্তুত হন, তারা তাঁর সত্য আদেশ পালনে বিমুখ কেন? ... কন্যাকে শিক্ষা দেওয়া আমাদের প্রিয় নবী 'ফরজ' অবশ্য পালনীয় কর্তব্য' বলিয়াছেন, তবু কেন তাঁহার কন্যারা শিক্ষায় উদাসীন?' (মতিচুর ২য় খণ্ড)। সর্বক্ষেত্রেই রোকেয়া ছিলেন বিপ্লবী ও সাহসী।

বর্তমান শতাব্দীর শেষ সীমায় আমরা নারীকে কারখানা থেকে কৃষিক্ষেত্র পর্যন্ত কর্মরত দেখতে পাচ্ছি। রোকেয়া শুরুতেই নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় দুঃসাহসিক ঘোষণা দিয়েছিলেন। কোনো পারিবারিক আনুকুল্য রোকেয়া পাননি। কোনও আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জনের সুযোগ রোকেয়ার হয়নি। রোকেয়া নিজেই নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বঞ্চিত রোকেয়া ছিলেন একাধিক ভাষায় সুপণ্ডিত। এ যুগসন্ধিক্ষণে এক কঠিন সময়ে রোকেয়া কোনো সহযোগী ছাড়াই একা এদেশের নারী-জীবনে মুক্তির আলো আনার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর প্রতিভা ছিল বহুমুখী। সমকালীন সমাজব্যবস্থা, কৃষক ও কৃষিব্যবস্থা, কুটির শিল্পের দূরাবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ত্রুটি নিয়ে তিনি সুচিন্তিত ও নিপুন আলোচনা করেছেন। তিনি একজন মহান মানুষ, আপসহীন সংগ্রামী। একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে সমাজে নারী শিক্ষার অনেকখানি প্রসার ঘটেছে। কিন্তু এতে সন্তুষ্টির অবকাশ নেই। ইদানিং শিক্ষিত হলেও মুক্তবুদ্ধির চেতনা থেকে আজও আমরা বঞ্চিত।

শিক্ষিত মুসলমান সমাজের একটা বড় অংশ কুরআন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ভুলে যেতে বসেছে। আর যারা আজও শিক্ষা বঞ্চিত তাদের কাছে এ উন্নত মানসিকতা আশা করা যায় না। কারণ ইসলাম শিক্ষিতের ধর্ম, মূর্খ-অজ্ঞের ধর্ম নয়। আজও চতুর্দিকে দারুণ হা-হুতাশ ইসলাম ধর্মের জন্য মুসলমান নারীর জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে। ইসলামের ঘাড়ে সব দায় চাপিয়ে দিয়ে বিখ্যাত হওয়া যাচ্ছে অতি সহজে। কিন্তু শিক্ষার প্রকৃত গুণ মানুষের জানার আকাঙ্খা বাড়ায়, বুদ্ধির মুক্তি ঘটায়। বেগম রোকেয়া সে দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক সঙ্কটের বিচার করতে পেরেছিলেন। সৌন্দর্য ও শালীনতাবোধ এবং জ্ঞানপিপাসা ইসলাম ধর্মের অঙ্গ। অশালীন ও উশৃঙ্খল জীবনের ছাড়পত্র এখানে পাওয়া যায় না। বেগম রোকেয়া সৌন্দর্য

ও শালীনতার একনিষ্ঠ পূজারী ছিলেন; সেই সঙ্গে ছিল তাঁর অপরিসীম সম্ভ্রমবোধ। একটি প্রবন্ধে তিনি জোরগলায় বলতে পেরেছিলেন, "তাই সরাসরি বলতে পেরেছেন, উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত ভগ্নীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তাঁরা প্রায়ই বোরখা ছাড়তে বলেন, বলি, উন্নতি জিনিষটা কি? তা কি কেবল বোরকার বাহিরে থাকে? যদি তাই হয় তবে বুঝবে যে, জেলেনী, চামারনী, কি ডুমনী প্রভৃতি স্ত্রী লোকেরা আমাদের চেয়ে অধিক উন্নতি লাভ করেছেন। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, 'আমরা অপ্রয়োজনীয় পর্দা রাখব?' জীবনদর্শনের এ বলিষ্ঠ ভূমিকায় রোকেয়া ছিলেন আপোশহীন। পণ্য নয়, নারীকে বলিষ্ঠ মানুষের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাঁর সাধনা। কিন্তু অবরোধবন্দিনী নারী বন্দী জীবনের মুক্ত প্রাঙ্গণে কি প্রকৃত অর্থে মুক্তি পেয়েছে সে প্রশ্ন রয়েই যায়।

বেগম রোকেয়া পর্দাপ্রথার বিরোধী ছিলেন না- তবে গোঁড়ামির বিরোধী ছিলেন। তিনি উগ্র নারীবাদীদের মতো বোরখা ছিঁড়ে ফেলে দেননি বরং তিনি সমাজের কথা চিন্তা করে বোরখা প্রথা মেনে চলতেন। কেননা তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল সমাজকে জাগিয়ে তোলা। তিনি 'সওগাত' সম্পাদককে লেখা চিঠিতে বলেছেন, 'আমি যে অনিচ্ছাকৃতভাবে অবরোধবাসিনী হয়েছি তার কারণ আছে। আমার স্কুলটা আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়। একে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমি সমাজের অযৌক্তিক নিয়ম-কানুনগুলোও মেনে চলছি। অবস্থা এরূপ এখন যে আমি পর্দার আড়ালে থেকে আপনার সঙ্গে কথা বলছি, এটাও হয়তো দোষণীয় হয়ে পড়ছে। আমি বাড়িতে বাড়িতে ক্যানভাস করে মেয়ে আনতে যাই, কিন্তু অভিভাবকরা আমাকে আগেই জিজ্ঞেস করেন, পর্দাপালন করা হয় কি না? অতটুকু ছোট মেয়ের বেলায়ও এ প্রশ্ন। এখন বুঝুন, কী পরিস্থিতির মাঝে স্কুল চালাচ্ছি, আর ব্যক্তিগতভাবে আমার অবস্থাই বা কীরূপ?

প্রত্যেকটি স্কুলের জন্য আমি সমাজের সকল অবিচার, অত্যাচার সহ্য করেছি। পর্দা প্রথা সম্বন্ধে 'বোরকা' প্রবন্ধে বেগম রোকেয়া লিখেছেন 'আমরা পর্দার অপ্রয়োজনীয় অংশ ছাড়িয়া আবশ্যকীয় পর্দা রাখিব। প্রয়োজন হইলে অবগুণ্ঠনসহ মাঠে বেড়াইতে আমাদের আপত্তি নাই'। রোকেয়া কথাগুলো যে যুগে দাঁড়িয়ে বলেছেন সে যুগে নারীরা, বিশেষত মুসলিম নারীরা ছিলেন অন্তঃপুরচারিণী, অসূর্যস্পর্শা। শুধু সন্তানের জন্ম দেওয়া এবং ঘরের অভ্যন্তরীণ কাজ চালানোই ছিল তাদের কাজ। কোনও, অভিযোগ কিংবা আকাঙ্খা ব্যক্ত করার কথা চিন্তাই করতে পারতেন না তারা। তার ওপর ছিল যখন তখন 'তালাক'-এর নির্মম আঘাত। এ তালাক প্রসঙ্গে বেগম রোকেয়া তাঁর জীবনের শেষ প্রবন্ধ 'নারীর অধিকার' নিয়ে তিনি লিখেছেন, 'আমাদের উত্তরবঙ্গে দেখেছি গৃহস্থ শ্রেণীর মধ্যে সর্বদা তালাক হয়, অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীকে সামান্য অপরাধে পরিত্যাগ করে। মেয়েটির কোনও ত্রুটি হলেই স্বামী দম্ভ করে প্রচার করে "আমি ওকে তালাক দেব, আজই দেব"। এ রকম ঘটনা সব সময়ই ঘটত।

এক সময়ে পুরুষটিকে খুব প্রফুল্ল দেখা যায়। বোধ হয় নতুন পত্নী লাভ হবে তাই এ আনন্দ। যুগের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও রোকেয়ার চিন্তাধারা কত আধুনিক ছিল তার প্রমাণ মেলে নারী সমাজের শৃঙ্খলিত হওয়ার ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে। তিনি লিখেছেন, 'আদিমকালের ইতিহাস কেহই জানে না বটে; তবু মনে হয় যে পুরাকালে যখন সভ্যতা ছিল না, সমাজে বন্ধন ছিল না, তখন আমাদের অবস্থা এরূপ ছিল না। কোনো অজ্ঞাত কারণবশত মানবজাতির এক অংশ (নর) যেমন ক্রমে নানা বিষয়ে উন্নতি করতে লাগল, অপর অংশ (নারী) তার সঙ্গে সঙ্গে সেরূপ উন্নতি করতে পারল না বলে পুরুষের সহচরী বা সহধর্মিণী না হয়ে দাসি হয়ে পড়ল। আর এই যে আমাদের অতিপ্রিয় অলংকারগুলো এগুলো দাসত্বের নিদর্শন বিশেষ। এখন ইহা সৌন্দর্য বর্ধনের আশায় ব্যবহার করা হয় বটে; কিন্তু অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তির মতে অলংকার দাসত্বের নিদর্শন বিশেষ।

তাই দেখা যায়, কারাগারে বন্দীগণ পায়ে লৌহ নির্মিত বেড়ি পরে, আমরাও স্বর্ণরৌপ্যের বেড়ী অর্থাৎ মল পরি। উহাদের হাতঘড়ি লৌহ নির্মিত, আমাদের হাতঘড়ি স্বর্ণ বা রৌপ্য নির্মিত চুড়ি। ... আমরা দাসত্বের নিদর্শন ধারণ করেও আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করি- গর্বে স্ফিতা হই' (*মতিচুর*-১)। এ প্রসঙ্গে এ যুগের বিশিষ্ট মার্কসবাদী দার্শনিক শিবদাস ঘোষ বলেছেন, 'ব্যাপারটা অর্থাৎ নারীর শৃঙ্খলিত হওয়ার ঘটনা একদিনে ঘটেনি। উৎপাদন পদ্ধতি পাল্টাবার সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ চাষবাসের পদ্ধতি আবিষ্কৃত হবার ফলে প্রেমের ক্ষেত্রে পুরুষদের প্রাধান্য এসে গেল, এবং মেয়েদের সন্তান ধারণ করতে হয় বলে এ নতুন পরিস্থিতিতে তারা পিছিয়ে পড়ল। ঘোষণা করল এবং নিজেদের আধিপত্য মেয়েদের ওপরে জোর করে চাপিয়ে দিল। ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত পুরুষ শাসিত সমাজের স্বার্থের অনুকূলে তাদের মানাবার জন্য নীতি-আদর্শ অনেক কিছুই আসতে থাকল এবং ধীরে ধীরে পুরুষ শাসিত সমাজের নীতি আদর্শ ইত্যাদিতে মেয়েরা অভ্যস্ত হয়ে পড়ল। কালক্রমে মেয়েরাও পুরুষের সম্পত্তিতে পরিণত হলো। তারপর একদিন এমন অবস্থা দাঁড়িয়ে গেল যে, আমরা দেখতে পাই মেয়েরা নিজেরাই স্ত্রী স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কথা বলছে।'

প্রায় সব রচনাতেই রোকেয়া প্রকাশ করেছেন ধর্মীয় বিধানের অপব্যবহারের কথা, সে যুগের নারীদের শারীরিক, মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক অবরুদ্ধতার কথা। কোনো কোনো রচনায় প্রকাশিত হয়েছে সমাজ উন্নয়নে নারী ও পুরুষের যৌথ অবদানের গুরুত্ব। এমনকি কিছু রচনায় নারী ও পুরুষের সম্পর্ক ও তার বিভিন্ন মাত্রিকতার বিশ্লেষণে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং সংস্কারমুক্ত আধুনিক চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

সমকালীন রাজনীতির প্রসঙ্গও স্থান পেয়েছে তাঁর লেখায়। মুক্তচিন্তা, ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি এবং শাণিত লেখনীর মধ্য দিয়ে বেগম রোকেয়া বিশ শতকের একজন বিরল ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছেন। সে যুগের প্রখ্যাত চিন্তাবিদ ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সরোজিনী নাইডু, তদানীন্তন বড়োলাট পত্নী লেডী চেমসফোর্ড, লেডী কারমাইকেল, ভূপালের বেগম সুলতান জাহান প্রমুখ নারী বেগম রোকেয়ার সাহিত্য ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের উচ্ছসিত প্রশংসা করেন এবং তাঁর কাজের প্রতি তাঁদের সমর্থন ব্যক্ত করেন।

বাঙালি মুসলমান সমাজে নারীর স্বাতন্ত্র ও নারী স্বাধীনতার পক্ষে প্রথম প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর বেগম রোকেয়া। বিশ শতকের প্রথম দিকে বাঙালি মুসলমানদের নবজাগরণের সূচনালগ্নে নারীশিক্ষা ও নারী জাগরণে তিনিই প্রধান নেতৃত্ব দেন। মুসলমান সমাজের ঘোর অন্ধকার যুগে নারী জাগরণের ক্ষেত্রে বেগম রোকেয়া ভূমিকা ছিল ব্যতিক্রমী এবং অনন্য সাধারণ। অবরোধ প্রথার শেকল ভেঙে তিনি বেরিয়ে আসেন অসামান্য সাহস, প্রবল আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ় সংকল্প নিয়ে। বেগম রোকেয়াই প্রথমবারের মতো বাঙালি মুসলিম সমাজে পুরুষের পাশাপাশি নারীর সমান অধিকারের দাবি তুলে ধরেন এবং নারী স্বাধীনতার পক্ষে নিজের মতবাদ প্রচার করেন। কর্তব্যকর্ম হিসেবে নারীশিক্ষা বিস্তারে তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন:

–"শিক্ষার অভাবে আমরা স্বাধীনতা লাভের অনুপযুক্ত হইয়াছি। অযোগ্য হইয়াছি বলিয়া স্বাধীনতা হারাইয়াছি। অদূরদর্শী পুরুষেরা ক্ষুদ্র স্বার্থ রক্ষার জন্য এতদিন আমাদিগকে শিক্ষা হইতে বঞ্চিত রাখিতেন" (বেগম রোকেয়া, ৬১)।

– অন্যত্র তিনি বলেছেন: "আমরা পুরুষের ন্যায় সুশিক্ষা অনুশীলনের সম্যক সুবিধা না পাওয়ায় পশ্চাতে পড়িয়া আছি। আমরা যে কেবল উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে অবনত হইয়াছি, তাই বুঝিতে ও বুঝাইতে চাই"। (বেগম রোকেয়া, ৪৩-৪৪)। সাহিত্যচর্চা, সংগঠন পরিচালনা ও শিক্ষাবিস্তার এই ত্রিমাত্রিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বেগম রোকেয়া সমাজ সংস্কারে এগিয়ে আসেন এবং স্থাপন করেন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর অন্যতম লক্ষ্য ছিল নারীশিক্ষার প্রসার, নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি এবং মুসলমান সমাজের অবরোধ প্রথার অবসান। শিক্ষা ব্যতীত নারীজাতির অগ্রগতি ও মুক্তি সম্ভব নয়, এ সত্য অনুধাবন

করেই তিনি নারীশিক্ষা প্রসারের কাজে ব্রতী হন। নারীদের তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন মানুষ হিসেবে এবং সমাজের অর্ধেক হিসেবে। নারীর মর্যাদার স্বীকৃতির লক্ষ্যেই পরিচালিত হয় তাঁর সমগ্র প্রয়াস। তাঁর মধ্যে ছিল একজন যোগ্য শিক্ষকের প্রজ্ঞা, সমাজ সংস্কারকের অন্তর্দৃষ্টি এবং মানবতাবাদীর নির্মল চেতনা। বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের ইতিহাসে বেগম রোকেয়ার অবদান চিরঅম্লান।

মুসলিম সমাজ ব্যবস্থা

ইসলাম ধর্ম হচ্ছে শান্তি ও মানবতার ধর্ম। মানবসেবা ও মানবকল্যাণ ইসলামের বিধান, ত্যাগ ও উদারতার ধর্ম। বেগম রোকেয়া তাঁর সংবেদনশীল মন ও জীবনবোধকে আশ্রয় করে তৎকালীন কিছু কিছু ধর্মান্ধ মুসলিম ও নারী সমাজকে প্রত্যক্ষ করেছেন। বাস্তবতার সঙ্গে জীবনের মিল খুঁজে না পেয়ে দেখেছেন- ধর্মান্ধতা, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, দেশাচারের দাস, ক্লেদাক্ত, গতিহীন, শক্তিহীন, নিথর এক সমাজব্যবস্থাকে। উপলব্ধি করেছেন সার্বিক অধঃপতনের হাত থেকে নারী জাতিকে রক্ষা করে তুলতে হলে আত্মপ্রতিষ্ঠা ও জ্ঞানালোকের পথে অগ্রসর হতে হলে তার নিথর সমাজকে শিক্ষা-দীক্ষা, মানবিক মূল্যবোধের চেতনা দিয়ে উজ্জীবিত করতে হবে। বস্তুত শিক্ষার আলোয় আলোকিত সমাজ গঠনের মানসে আধুনিক শিক্ষার গতির সঞ্চার এবং স্বাধীন নারী হিসেবে সাহস ও ঘর থেকে বের হওয়ার জ্ঞানশক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। তিনি জানান, জন্মগত ধর্মান্ধতা ও সংকীর্ণতা এবং পুরুষ ও নারীর মধ্যে ভেদাভেদের বাঁধ ভেঙে নারীদেরকে নতুন করে ঘুরে দাঁড়াতে হবে। তিনি স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন- পুরুষশাসিত সমাজ থেকে নারীদেরকে বের করে আনতে না পারলে নারীরা যুগে যুগে পিছিয়ে ছিলেন এখনও পিছিয়ে থাকতে হবে সন্দেহ নেই। এমন কি আধুনিক শিক্ষার পঠন-পাঠনের মাধ্যমে অশিক্ষক, অর্ধশিক্ষিত এবং শিক্ষার আলো বঞ্চিত নারী সমাজকে বিমুক্ত করে পঠন-পাঠন অপরিহার্য। কারণ তাদের মনে পরিশুদ্ধ, সত্যনিষ্ঠা ও যুক্তিবাদী চেতনা জাগাতে হবে।

অসাম্প্রদায়িক চেতনা

বেগম রোকেয়া একজন নারী হয়েও তাঁর চিন্তা-চেতনা সামাজিক, সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড এবং ক্ষুরধার লেখনীর মধ্যে অসাম্প্রদায়িক চেতনার মনোভাব ফুটে উঠেছে। তিনি তাঁর লেখনীর মধ্য দিয়ে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, আপন সমাজকে তাঁর বিশেষ কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিলেও এবং বাংলার মুসলমান নারীদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ও তাদের দুর্দশা-মোচনের প্রচেষ্টায় আজীবন ভারতীয় নারীর দুঃখ-দুর্দশার কথা বলতে গিয়ে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নারীদের দুরবস্থার চিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন। 'পদ্মরাগ' উপন্যাসে সিদ্দিকা ও সৌদামিনীর নিগ্রহের কাহিনি তিনি সমান দরদ দিয়ে বর্ণনা করেছেন। তাঁর কল্পিত 'তারিনী-ভবনে শুধু যে নানা জাতি, নানা ধর্ম এবং নানা শ্রেণীর লোক আছে (বেগম রোকেয়া, রো,র, ৪১১)। তাই নয়, সেখানে- কি সুন্দর সাম্য।- মুসলমান, হিন্দু, ব্রাহ্ম, খ্রিষ্টান সকলে যেন এক মাতৃগর্ভজাত সহোদরার ন্যায় মিলেমিশিয়া কার্য করিতেছে। (ঐ, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, রো,র, ৩২৯)। একজন নারী হয়ে বেগম রোকেয়া সার্বজনীন দৃষ্টি ভঙ্গি দিয়ে অসাম্প্রদায়িক কার্যক্রমে যে অবদান রেখে গেছেন বিশ্বায়নের যুগে এসে আমরা যদি তাঁর আদর্শের উত্তরসূরী হয়ে মানুষ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে একে অপরকে অভিন্ন চেতনা গ্রহণ তৈরি করতে পারি তাহলে বেগম রোকেয়ার আদর্শের উত্তরসূরি বিনির্মাণে আর কোনো বাধা থাকবে না। তখনই সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প আর কোনোভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না।

সাহিত্যচর্চা

ভাষা ও সাহিত্যজ্ঞান না থাকলে সাহিত্য রচনা করা অসম্ভব। বেগম রোকেয়ার মধ্যে বাল্যকাল থেকে সেই ভাষাজ্ঞান ও সাহিত্য প্রতিভার স্ফূরণ ঘটেছিল। বাড়িতে বসে বসে সেই জ্ঞানসাধনা অর্জনে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্য পড়ে তিনি ভাষাজ্ঞান আয়ত্ত করেছিলেন।

সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৯০২ সালে। কলকাতা থেকে প্রকাশিত *নবপ্রভা* পত্রিকায় ছাপা হয় *'পিপাসা'*। বিভিন্ন সময়ে তার রচনা নানা পত্রিকায় ছাপা হতে থাকে। ১৯০৫ সালে প্রথম ইংরেজি রচনা *সুলতানাজ ড্রিম বা 'সুলতানার স্বপ্ন'* মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকায় ছাপা হয়। সবাই তার রচনা পছন্দ করে। তিনি সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন। তাঁর সাহিত্যচর্চার সূত্রপাতও ঘটে স্বামীর অনুপ্রেরণায়। ১৯০২ সালে পিপাসা নামে একটি বাংলা গল্প লিখে সাহিত্যজগতে তাঁর অবদান রাখা শুরু হয়। এরপর একে একে লিখেন *মতিচূর*-এর প্রবন্ধগুলো এবং সুলতানার স্বপ্ন-এর মতো নারীবাদী বিজ্ঞান কল্পকাহিনি।

সাহিত্যিক হিসেবে তৎকালীন যুগের প্রেক্ষাপটে রোকেয়া ছিলেন এক ব্যতিক্রমী প্রতিভা। যে যুগে তিনি সৃজনশীল লেখনী ধারণ করেছিলেন সে যুগে একজন নারীর কাছ থেকে তা আশা করা কঠিন ছিল। এ পরিস্থিতিতে একজন আলোকিত নাকি রক্ষণশীল পরিবারের মেধাবী নারী হিসেবে ক্ষুরধার লেখনী প্রশংসার দাবি রাখে। তাঁর লেখাগুলো- *নবনূর, সওগাত, মোহাম্মদী, নবপ্রভা, নারী, ভারত নারী, আল এসলাম, নওরোজ, মাহে নও, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা*, প্রভৃতি পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হতো। তাঁর প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় ১৯০৩ সালে *নবনূর পত্রিকায়*। মতান্তরে, তাঁর প্রথম লেখা *'পিপাসা' (মহরম)* প্রকাশিত হয় ইংরেজি ১৯০২ সালে, চৈত্র ও বৈশাখ ১৩০৮-১৩০৯ *(যুগ্মসংখ্যা) নবপ্রভা পত্রিকায়*। সমকালীন সাময়িকপত্রে মিসেস আর.এস হোসেন নামে তাঁর রচনা প্রকাশিত হতো।

বেগম রোকেয়ার সমগ্র সাহিত্যকর্মের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে সমাজের কুসংস্কার ও অবরোধ প্রথার কুফল, নারী শিক্ষার পক্ষে তাঁর নিজস্ব মতামত, নারীদের প্রতি সামাজিক অবমাননা এবং নারীর অধিকার ও নারী জাগরণ সম্পর্কে তাঁর প্রাগ্রসর ধ্যানধারণা। বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধেও তাঁর লেখনী ছিল সোচ্চার। পুরুষশাসিত সমাজে নারীর দুরবস্থা এবং দৈহিক ও মানসিক জড়ত্ব থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় যে শিক্ষা এ ধারণাই রোকেয়া তুলে ধরেন তীক্ষ্ণ ভাষায় ও তীর্যক ভঙ্গিতে। এক প্রতিকূল সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের খণ্ড খণ্ড চিত্র ফুটে উঠেছে তাঁর রচনায়। সমাজের নিচুতলার মানুষের জীবনের দুর্দশার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে তাঁর বহু প্রবন্ধ ও নকশাজাতীয় রচনায়।

ছোটগল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস ও শ্লেষাত্মক রচনায় বেগম রোকেয়ার শৈলী ছিল স্বকীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। উদ্ভাবনা, যুক্তিবাদিতা এবং কৌতুকপ্রিয়তা তাঁর রচনার সহজাত বৈশিষ্ট্য। তাঁর প্রবন্ধের বিষয় ছিল ব্যাপক ও বিস্তৃত। বিজ্ঞান সম্পর্কেও তাঁর অনুসন্ধিৎসার পরিচয় পাওয়া যায় বিভিন্ন রচনায়। সমকালীন যুগের বিদ্যানুরাগী সমাজহিতৈষী পুরুষ এবং নারীদের নিকট থেকে বেগম রোকেয়া নানাভাবে সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করেন। *সওগাত* পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন তাঁকে উৎসাহিত করেন স্বাধীন মতামত প্রকাশের জন্য। সওগাতের সঙ্গে বেগম রোকেয়ার সম্পৃক্ততা ছিল নিবিড়। এ পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার (অগ্রহায়ণ ১৩২৫) প্রথম পৃষ্ঠায় বেগম রোকেয়ার 'সওগাত' কবিতাটি ছাপা হয়। এছাড়া তাঁর বহু প্রবন্ধ ও কবিতা *সওগাত* এ প্রকাশিত হয়।

বেগম রোকেয়ার উল্লেখযোগ্য রচনার *Sultana's Dream (নকশাধর্মী রচনা, ১৯০৮), পদ্মরাগ* (১৯২৪), *অবরোধবাসিনী* (নকশাধর্মী গদ্যগ্রন্থ, ১৯৩১) প্রভৃতি। এছাড়া আছে অসংখ্য প্রবন্ধ, ছোটোগল্প, কবিতা, ব্যঙ্গাত্মক রচনা ও অনুবাদ| *Sultana's Dream* গ্রন্থটি রোকেয়া নিজেই বাংলায় অনুবাদ করেন *সুলতানার স্বপ্ন* নামে। এটি একটি প্রতীকী

রচনা এবং এতে বর্ণিত Lady Land বা নারীস্থান মূলত বেগম রোকেয়ারই স্বপ্নকল্পনার প্রতীক। *মতিচূর, পদ্মরাগ, অবরোধবাসিনী, সুলতানার স্বপ্ন* প্রভৃতি গ্রন্থে বেগম রোকেয়ার ঐকান্তিক স্বপ্নই এক অভিনব রূপ পেয়েছে। মতিচূর ২য় খণ্ডে আছে 'সৌরজগৎ', 'ডেলিসিয়া হত্যা' (মেরী করেলী রচিত The Mussalman, *Indian Ladies Magazine* ১৮৯৬ উপন্যাসের গল্পাংশের অনুবাদ), 'জ্ঞান ও ফল', 'নারী ও সৃষ্টি', 'নার্স নেলী', 'মুক্তি ও ফল' প্রভৃতি গল্প ও রূপকথা।

বাংলা ও ইংরেজিতে লেখা তাঁর অসংখ্য চিঠিপত্র রয়েছে। বাংলা ভাষার প্রতি ছিল তাঁর গভীর মমত্ববোধ। সে যুগের অভিজাত শ্রেণির মুসলমানদের ভাষা ছিল উর্দু। কিন্তু রোকেয়া উপলব্ধি করেন যে, এদেশের অধিকাংশ মুসলমানের ভাষা বাংলা। তাই বাংলা ভাষা ভালোভাবে আয়ত্ত করে এই ভাষাকেই তাঁর বক্তব্য প্রকাশের বাহন হিসেবে ব্যবহার করেন। ১৯২৭ সালে বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সম্মেলনে বেগম রোকেয়া বাংলা ভাষার পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন যা সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে ছিল দুঃসাহসিক কাজ।

বিদুষী নারী বেগম রোকেয়া এক অনন্য প্রতিভার অধিকারিণী ছিলেন। সাহিত্যচর্চা, শিক্ষাবিস্তার ও প্রথম মুসলিম নারী সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা- এই তিন ধারায় তাঁর প্রতিভা বিকশিত হয়েছে। শত বাধা-বিঘ্ন ও প্রতিকূলতার মধ্যেও তিনি দৃঢ় পদক্ষেপে স্বীয় লক্ষ্যপথে অগ্রসর হয়েছেন। হতভাগ্য মুসলমান সমাজে বেগম রোকেয়া এক বিরল প্রতিভা। এই প্রসঙ্গে মো. আবদুল হাই বলেন, রবীন্দ্রযুগে যে কয়জন মুসলিম মহিলা বাংলা সাহিত্যে সাধনা করেন, বেগম রোকেয়া তাদের মধ্যে প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ।

বেগম রোকেয়ার অসামান্য উক্তি

প্রতিভা এবং অভিজ্ঞতা পুরুষ-নারী সবাইকে আলোকিত ও দীপ্তিমান করে না শুধু; শিক্ষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও সভ্যকার ক্রমবিকাশে যুগে যুগে মানুষকে জাগিয়ে তোলার পথ দেখায় মহিয়সী নারী বেগম রোকেয়া তাঁর সৃজনশীল মেধা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে নারী জাতির জাগরণের ক্ষেত্রে শুধু নয় পুরুষদের নীতি- নৈতিকতার উন্মেষে তাঁর বাণী আদর্শ স্থানীয় তাঁর এ অমূল্য বাণী সকলের জ্ঞাতার্থে প্রণীধানযোগ্য।

১। সর্ব অঙ্গেই ব্যাথা, ওষুধ দিব কোথা।

২। শিশুকে মাতা বলপূর্বক ঘুম পাড়াইতে বসিলে ঘুম না পাওয়ায় শিশু যখন মাথা তুলিয়া ইতস্ততঃ দেখে তখনই মাতা বলেন, ঘুমা শিগগির ঘুমা! ঐ দেখ জুজু! ঘুম না পাইলেও শিশু অন্তত চোখ বুজিয়া পড়িয়া থাকে। সেই রূপ আমরা যখন উন্নত মস্তকে অতীত ও বর্তমানের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, অমনই সমাজ বলে, ঘুমাও ঘুমাও! ওই দেখ নরক! মনে বিশ্বাস না হইলেও অন্তত আমরা মুখে কিছু না বলিয়া নীরব থাকি।

৩। বাস্তবিক অলংকার দাসত্বের নিদর্শন ভিন্ন আর কিছুই নহে। যদি অলংকারকে দাসত্বের নিদর্শন না ভাবিয়া সৌন্দর্য বর্ধনের উপায় মনে করা যায়, তাহাই কী কম নিন্দনীয়? সৌন্দর্য বর্ধনের চেষ্টাও কি মানসিক দুর্বলতা নহে?

৪। আমরা সমাজের অর্ধাঙ্গ, আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কীরূপ? কোনো ব্যক্তি এক পা বাঁধিয়া রাখিলে সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে? পুরুষের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে। তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা, আমাদের লক্ষ্য তাহাই।

৫। দেহের দুটি চক্ষুস্বরূপ, মানুষের সব রকমের কাজ কর্মের প্রয়োজনে দু'টি চক্ষুর গুরুত্ব সমান।

শিক্ষা লাভ করা সব নর নারীর অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু আমাদের সমাজ সর্বদা তাহা অমান্য করেছে।

৬। অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের শত দোষ সমাজ অম্লান বদনে ক্ষমা করিয়া থাকে। কিন্তু সামান্য শিক্ষাপ্রাপ্ত নারী দোষ না করিলেও সমাজ কোনো কল্পিত দোষ শতগুণ বাড়াইয়া সে বেচারির দোষ ঐ শিক্ষার ঘাড়ে চাপাইয়া দেয় এবং শত কণ্ঠে সমস্বরে বলিয়া থাকে স্ত্রী শিক্ষাকে নমস্কার!

৭। আমরা উপার্জন করিব না কেন? আমাদের কি হাত নাই, পা নাই, না বুদ্ধি নাই? কী নাই? যে পরিশ্রম আমরা স্বামীর গৃহকর্মে ব্যয় করি, সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসা করিতে পারিব না?

৮। কার্যক্ষেত্রে পুরুষের পরিশ্রমের মূল্য বেশি, নারীর কাজ সস্তায় বিক্রয় হয়। নিম্নশ্রেণীর পুরুষ যে কাজ করিলে মাসে ২ টাকা বেতন পায় ঠিক সেই কাজ স্ত্রীলোকে করিলে ১ টাকা পায়। চাকরের খোরাকী মাসিক ৩ টাকা আর চাকরানীর খোরাকী ৩ টাকা।

৯। ভগিনীরা! চুল রগড়াইয়া জাগিয়া উঠুন, অগ্রসর হউন! মাথা ঠুকিয়া বলো মা! আমরা পশু নই; বলো ভগিনী! আমরা আসবাব নই! বলো কন্যে আমরা জড়োয়া অলংকার রূপে লোহার সিন্দুকে আবদ্ধ থাকিবার বস্তু নই; সকলে সমস্বরে বলো আমরা মানুষ। না জাগিলে ভারত ললনা, এ ভারত আর জাগিবে না।

১০। আমরা পুরুষের ন্যায় সম্যক সুবিধা না পাইয়া পশ্চাতে পড়িয়া আছি।

১১। কন্যারা জাগ্রত না হওয়া পর্যন্ত দেশমাতৃকার মুক্তি অসম্ভব।

বেগম রোকেয়ার প্রতিটি বাণী মানব জীবনদর্শন ও জীবনমুক্তির পথের সন্ধান দেয়। বিশেষ করে নারীদেরকে পিছিয়ে রাখার যে প্রবণতা তার থেকে বের হয়ে আসা এবং ন্যায় অধিকার প্রতিষ্ঠার বিপ্লবী বাণী বললেও অত্যুক্তি হবে না।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

যে-কোনো মানুষ মহৎ ও মহান হয় স্বীয় চারিত্রিক গুণে। জীবনের অনেক কিছু ম্লান হয় কিন্তু নীতি-নৈতিকতা, আদর্শ, মানবিক গুণে যিনি দীপ্তিমান সেই জীবন হয় নন্দিত, বরেণ্য ও প্রাতস্মরণীয়। বেগম রোকেয়া সেই আদর্শের অনন্য প্রতিভূ ছিলেন। নম্রতা, ক্ষমাগুণ, অপরিসীম ধৈর্য, অতিথিপরায়ণ, প্রতিব্রতা, পিতৃসেবা এবং নৈতিক দায়িত্ব কর্তব্যকর্মে তিনি ছিলেন আন্তরিক। এসব মানবীয় গুণে গুণান্বিত বেগম রোকেয়া সকলের প্রিয় ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। একদিকে আদর্শ মা অন্যদিকে মানবপ্রেমী ও নারীবাদী চেতনাকে আমৃত্যু লালন ও ধারণ করেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাহসী ভূমিকা তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তিনি মুখে যা বলেন তা তিনি আদায় করে ছাড়তেন। কষ্ট হয়েছে কিন্তু বিফল হন নি। তাঁর চাহিদা ছিল না বরং তিনি ত্যাগী ছিলেন। নির্লোভ ও নির্মোহ চেতনা তাঁকে অনেক বড় এবং গ্রহণযোগ্যতা এনে দিয়েছে। এগুলোই হলো মানুষের মানবিক গুণাবলি। এখানে তিনি ব্যতিক্রমধর্মী অনন্য চরিত্রের নারী এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তাঁর এ মহান জীবনচরিত্র থেকে শিক্ষা নেওয়ার অনেক কিছু আছে।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

মানব জীবন দুর্লভ। এর চেয়েও দুর্লভ হচ্ছে কৃতজ্ঞ এবং কল্যাণমিত্র মানুষ পাওয়া। জীবনের সর্বক্ষেত্রে একে অপরের সাহায্য সহযোগিতা ছাড়া জীবনের সফলতা পাওয়া যায় না। যাঁদের কাছ থেকে আন্তরিক সহযোগিতা নিয়ে এতটুকু দীপ্তিমান ও সফলতা অর্জিত হয়েছে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা বিবেকবান মানুষের নৈতিক দায়িত্ব। অকৃতজ্ঞ মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে সমাজ ও দেশ অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। বিদুষী নারী বেগম রোকেয়া যাঁদের সহায়তায় জ্ঞানালোক প্রাপ্তি হয়েছেন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সামাজিক কর্মকাণ্ডে সহায়ক হিসেবে যাঁদের পেয়েছেন তাঁদের প্রতি তিনি

আমৃত্যু কৃতজ্ঞতা ও ঋণ স্বীকার করেছেন বিশেষ করে বড় ভাই ইব্রাহিম সাবের ও বোন করিমুন্নেসার প্রতি। এমনকি স্বামীর প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়ে স্বামীর নামে স্কুল প্রতিষ্ঠা বিশ্বের ইতিহাসে বিরল।

ক) দাদা! আমি আশৈশব তোমার স্নেহ-সাগরে ডুবিয়া আছি। আমাকে তুমিই হাতে গড়িয়া তুলিয়াছ। আমি জানি না, পিতা, মাতা, গুরু, শিক্ষক কেমন হয়, আমি কেবল তোমাকেই জানি: (বেগম রোকেয়া, রো. র, ঐ, ৩১৯)।

খ) আপাজান! আমি শৈশব তোমারই স্নেহের প্রসাদে বর্ণ-পরিচয় পড়িতে শিখি। অপর আত্মীয়গণ আমার উর্দু ও ফারসি পড়ায় তত আপত্তি না করিলেও বাংলা পড়ার অনুকূলে ছিল। আমার বিবাহের পর তুমিই আশঙ্কা করিয়াছিলে যে, আমি বাঙ্গালা ভাষা একেবারে ভুলিয়া যাইব (বেগম রোকেয়া, উৎসর্গপত্র, মতিচূর (২য় খণ্ড), রো. র, ঐ, ৭৬)।

গ) আমাকে সাহিত্যচর্চায় তিনিই (করিমুন্নেসা) উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। বলিতে কি, তিনি উৎসাহ না দিলে এবং আমার শ্রদ্ধেয় স্বামী অনুকূল না হলে আমি কখনই প্রকাশ্য সংবাদপত্রে লিখিতে সাহসী হইতাম না। (লুকানো রতন, ঐ, ২৮৮)।

মৃত্যু

১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর বেগম রোকেয়া মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৫২ বছর। তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে অপূর্ব একটি মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর তাঁর জন্ম এবং ১৯৩২ সালে ৯ ডিসেম্বর তাঁর মৃত্যু দিন। যুগে যুগে কিছু কিছু জ্ঞানতাপস, আত্মত্যাগী পুণ্যপুরুষ, সাধকশ্রেষ্ঠ ও মহামানবদের জন্ম ও মুত্যুর মধ্যে সার্যুজ্যতা অনেক আশ্চর্যজনক ও গভীর ভাবনার বিষয় নয় কী? মহিয়ষী নারী বেগম রোকেয়ার জীবন ইতিহাসেও জন্ম-মৃত্যুর তারিখটাও একই তারিখে। সেসময় তিনি '*নারীর অধিকার*' নামে একটি প্রবন্ধ লিখছিলেন। তাঁর উত্তর পরবর্তীকালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক অমলেন্দু দে আবিষ্কার করেন । বলা যায়, বহু কীর্তিমান মনীষীদের অমর স্মৃতি কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে এটাই যে-কোনো জাতির জন্য দুঃসংবাদ। বেগম রোকেয়া নশ্বর দেহ ছেড়ে চলে গেলেও তাঁর অসাধারণ নারী জাগরণের অবদান ও বহুমুখী কীর্তিকাহিনি বাংলার উর্বর ভূমিতে যুগে যুগে অম্লান হয়ে আছে এবং থাকবে অমর স্মৃতি হয়ে। এর পেছনে যিনি কাজ করেছেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য তনয়া দেশরত্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর দূরদৃষ্টি ও বদান্যতায় বর্তমান স্বাধীন বাংলাদেশে নারীদের ক্ষমতায়ন ও সুযোগ সুবিধা প্রদানে বিশ্বের ইতিহাসে দৃষ্টান্তস্বরূপ। বঙ্গবন্ধু যেমন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে স্বাধীন বাংলাদেশে এনে 'জাতীয় কবির' মর্যাদাসহ যাবতীয় দায়িত্ব রাষ্ট্রীয়ভাবে গ্রহণ করেছিলেন তেমনি বিদুষী নারী বেগম রোকেয়ার নারী জাগরণের অগ্রদূত হিসেবে মূল্যায়ন ও মর্যাদা দিতে গিয়ে দেশরত্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেগম রোকেয়ার নীতি-আদর্শকে রাষ্ট্রীয়ভাবে জাগিয়ে তোলার জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণসহ 'রোকেয়া পুরস্কার' প্রবর্তন করে নারী জাতির জাগরণের পথকে উন্মুক্ত করে আরেকটি নব ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। তাঁরই অপূর্ব একটি মর্মবাণী সকলের উদ্দেশ্যে তুলে ধরা সমীচীন মনে করি-

(প্রকৃতিরে) সুধাইনু "কি হল তোমার
সেই সৌন্দর্য আর সেই (বসন্ত) যৌবন?"
সহাস্যে উত্তর দিল সে, "ও প্রিয়তম!
আমি না ছিলাম, ছিল মহিমা স্রষ্টার।
(ড. কামরুল আহসান, ৪৮১)

তাঁর মৃত্যুকে ঘিরে পরবর্তী সময়ে যেভাবে তাঁর বিশাল কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন ও মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে সেই বিষয়ে কিছু তথ্য তুলে ধরা সমীচীন মনে করি-

৯ ডিসেম্বর, ১৯৩২। কলকাতার অদূরে সোদপুরে সমাধিস্থ। দৈনিক পত্রিকাগুলির পৃষ্ঠায় মৃত্যুসংবাদ। বাংলার গভর্নরের শোকবাণী প্রেরণ। অ্যালবার্ট হলে সভা। সভার উদ্যোক্তা : বঙ্গীয় পরিশীলন সমিতি, বঙ্গীয় মুসলমান ছাত্র সমিতি এবং আনজুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম সভা। সভানেত্রী : লেডী আবদুর রহিম। *মোহাম্মদী* পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা। ১৯৩৭ : বেগম রোকেয়া সম্পর্কে প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হ'লো- শামসুননাহার মাহমুদের "রোকেয়া জীবনী"। ১৯৮০ : বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে বেগম রোকেয়ার জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন। বেগম রোকেয়ার নামে স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ। ১৯৯৩ : 'বেগম রোকেয়া মৃত্যুবার্ষিকী সম্মিলিত উদ্‌যাপন কমিটি ১৯৯৩' কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণভাবে রোকেয়ার মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন (সৈয়দ আবদুল মান্নান, ১০০)।

এ প্রসঙ্গে বেগম রোকেয়াকে বাংলার মাটিতে চিরঞ্জীব করার ক্ষেত্রে যা যা কীর্তিকর্ম সৃষ্টি করেছেন তা সকলের জ্ঞাতার্থে প্রণিধানযোগ্য:

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন

সমাজ ও জাতির উন্নয়নে যিনি বা যাঁরা অবদান রাখেন তাঁদের কীর্তিময় আনন্দের বার্তা কোনোভাবে ভোলা যায় না। রোকেয়া একজন নারী হয়ে শিক্ষা ও সাহিত্যজগতে ভূমিকার বিষয় সর্বজন স্বীকৃত। তাছাড়াও সমাজ সংস্কার এবং ধর্মান্ধতা থেকে নারীকে মুক্ত করার জন্য তাঁর ক্ষুরধার লেখনী ছিল প্রতিবাদী কণ্ঠ। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন স্মরণে বাংলাদেশ সরকার একটি গণউন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন। বাংলাদেশের রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার পায়রাবন্দ গ্রামে পৈতৃক ভিটায় ৩ দশমিক ১৫ একর ভূমির উপর নির্মিত হয়েছে বেগম রোকেয়া স্মৃতি কেন্দ্র। এতে অফিস ভবন, সর্বাধুনিক গেস্ট হাউজ, ৪ তলা ডরমেটরি ভবন, গবেষণা কক্ষ, লাইব্রেরি ইত্যাদি রয়েছে। স্মৃতিকেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে বাংলাদেশ সরকারের শিশু ও নারী বিষয়ক মন্ত্রণালয়। এ বিশাল কর্মযজ্ঞের শুভ উদ্‌বোধন করেন ২০০১ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা।

বেগম রোকেয়ার বিশাল কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি

৭ম বিভাগ হিসেবে রংপুর বিভাগের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে 'রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়' ৮ অক্টোবর ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর ২০০৯ সালে 'নারী জাগরণের অগ্রদূত' হিসেবে তাঁর নামকে স্মরণীয় করে রাখতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়টির বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় নামকরণ করেন। উল্লেখ্য, নারীর নামে বাংলাদেশে প্রথম কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এটি। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ২২টি বিভাগে বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদান করা হয়। বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ১২ হাজার। ৩০ জন শিক্ষার্থী বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত। বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক ড. হাসিনুর রশীদ এবং আচার্য মহামান্য রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ। ৭৫ একর জমি নিয়ে অত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রথম উপাচার্য ছিলেন প্রফেসর ড. এম লুৎফর রহমান।

বেগম রোকেয়ার নামে সর্বপ্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৬০-এর দশকে ছাত্রীনিবাস 'রোকেয়া হল' খোলা হয় যার নাম আগে ছিল 'উইমেন্স হল'; তবে ব্রিটিশ আমলে ১৯৩৮ সালে 'চামেলি হাউজ' নামে প্রথমে হলটি চালু হয়েছিল। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েও 'রোকেয়া হল' নামে একটি হল স্থাপন করা হয়েছে। এই সকল সেবামূলক প্রতিষ্ঠান যতদিন

বিদ্যমান থাকবে ততদিন মহিয়সী নারী রোকেয়ার নাম চির অমর হয়ে থাকবে। মহীয়সী বাঙালি নারী হিসেবে বেগম রোকেয়ার অবদানকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রীদের আবাসনের জন্য আবাসিক হল *রোকেয়া হল* নামকরণ করা হয়। প্রতি বছর ৯ ডিসেম্বর তাঁর জন্মদিনে বেগম রোকেয়া দিবস পালন করা হয় এবং নারী উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য বিশিষ্ট নারীদেরকে 'বেগম রোকেয়া পদক' প্রদান করা হয়। ১৯৮০ সালে বেগম রোকেয়ার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে বাংলাদেশ ডাক বিভাগ দুটি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করে।

২০০৪ সালে বিবিসি বাংলা একটি 'শ্রোতা জরিপ' এর আয়োজন করে। বিষয়টি ছিল সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি কে? তিরিশ দিনের ওপর চালানো জরিপে শ্রোতাদের ভোটে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ ২০জনের জীবন নিয়ে বিবিসি বাংলায় বেতার অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয় ২০০৪ এর ২৬শে মার্চ থেকে ১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত। বিবিসি বাংলার সেই জরিপে শ্রোতাদের মনোনীত 'শীর্ষ বিশজন বাঙালির তালিকায় ষষ্ঠ স্থানে আসেন বেগম রোকেয়া'। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংবাদমাধ্যম বিবিসি কর্তৃক বিদুষী মহিলা বেগম রোকেয়ার নারী জাগরণের বিশাল কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে বিশজনের মধ্যে ষষ্ঠ স্থানে নির্বাচিত করে বিরল সম্মানে সম্মানিত করেছেন। যা বাঙালি জাতির জাতীয় জীবনে অতীব আত্মশ্লাঘার বিষয়।

বাঙালি সমাজ যখন ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা আর সামাজিক কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল, সেই সময় বেগম রোকেয়া বাংলার মুসলিম নারী সমাজে শিক্ষার আলো নিয়ে এসেছিলেন। বাঙালি মুসলমান নারী জাগরণের তিনি ছিলেন অন্যতম একজন পথিকৃৎ।

উপসংহার

নারী জাগরণের অগ্রদূত প্রবাদপ্রতীম বেগম রোকেয়ার জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম আজও বিশ্বের নারী জীবনে এক কিংবদন্তীতুল্য, অনুকরণীয়, অনুসরণযোগ্য এবং প্রেরণাদায়ী সত্তা। তাঁর সমাজসেবা, নারী শিক্ষার প্রসার, সাহিত্য-সাধনার ত্রিবিধ আয়োজনের সমন্বয় হয়েছে তাঁর মধ্যে। ধর্মে অনুমোদিত অধিকারসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সংগ্রামের আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি। পুরুষের কাছে দয়া বা অনুগ্রহ ভিক্ষা নয়, পুরুষের আধিপত্য ও দুঃশাসনের প্রতিবাদ করে অধিকার প্রতিষ্ঠার দৃঢ়তা প্রকাশিত হয়েছে তাঁর রচনাবলিতে। স্বাধীনতার পূর্বশর্ত হিসেবে তিনি নির্দেশ করেন শিক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতাকে। আমরা দেখতে পেয়েছি যে, বিচিত্র ঘটনাবহুল জীবনে রোকেয়া নিরন্তর যোদ্ধার ভূমিকা পালন করেছেন। সীমাবদ্ধতা, দুর্বলতা ও বিপর্যয়কে যেমন তিনি মেনে নিয়েছেন, তেমনি বিজয় ও সফলতাও অর্জন করেছেন। মূলত তিনি একজন নারী হয়েও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত হওয়ার সুযোগ লাভ না করেও ঘরে বসে বসে পারিবারিক ঐতিহ্য অনুসারে পিতা ও অগ্রজ ভাইবোনদের সাহচর্যে কঠোর অধ্যবসায়, গভীর নিষ্ঠা, একাগ্রতা, প্রচেষ্টা জ্ঞানান্বেষী চেতনাকে অন্তরে ধারণ করে সাধ্যমতো যা অর্জন করেছেন তা অভূতপূর্ব ও বিস্ময়কর। তাঁর অধীত বিদ্যা তৎকালীন পিছিয়ে থাকা নারীদেরকে ঘর থেকে বের করে এনে সকলের অন্তরে জ্ঞানালোকে আলোকিত করে তুলেছিলেন বলে তিনি আজ নারী সমাজের পথ প্রদর্শক ও মাতৃতুল্য অভিভাবক। কথায় বলে:

"মা নাই গৃহে যার, সংসার অরণ্য তাঁর।
দেখলে মায়ের মুখ ঘুছে যায় সব দুঃখ"।

নারীপ্রেমী রোকেয়া আদর্শ মায়ের মর্যাদা লাভে ধন্য। সংক্ষেপে বলা যায়। তাঁর জীবনদর্শনে কোনো মোড়ক ছিল না, ছিল না কোনো লোক প্রদর্শনকারী উপাধি। তাঁর জীবনাদর্শ ছিল একান্ত সহজাত, আন্তরিক। কথায় ও কাজে তাঁর

কোনো ফারাক ছিল না। তাঁর চিন্তা, মন ও জীবনযাপন ছিল একসূত্রে গ্রন্থিবদ্ধ। বাঙালি নারী জাতির অপ্রেমেয় কল্যাণমিত্র রোকেয়ার মতো জীবন বড় দুর্লভ। অহংকার করে বলতে পারি, জীবিত বেগম রোকেয়া থেকে মৃত রোকেয়া অনেক বড়। সেজন্যই বেগম রোকেয়ার জীবনাদর্শন সর্বকালে বরেণ্য-কালোত্তীর্ণ এবং সর্বকালে প্রাসঙ্গিক। নিম্নোক্ত কাব্যিক ছন্দটির মধ্যে তাঁর জীবন দশনের সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়-

"ঘুমন্ত জাতির জীবনে জাগানো বসন্তের শিহরণ
সমাজকল্যাণে স্বার্থ বলি দিয়ে রাখিয়াছে অবদান
কত ভ্রান্ত জনে সুপথে ফিরাল মানবতার অভিযানে
জীবন তাদের করিল ধন্য অসীম শান্তি নিকেতনে"
(বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন)।

"জয়তু নারী জাগরণের অগ্রদূত"

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিঃ

আবদুল মান্নান সৈয়দ, *বেগম রোকেয়া*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩।

সুফী মোতাহের হোসেন, *বেগম রোকেয়া জীবন ও সাহিত্য*, মাওলা ব্রাদার্স, বাংলা বাজার, ঢাকা, ২০০১।

তাহমিনা আলম, *বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন চিন্তা-চেতনার ধারা ও সমাজকর্ম*, বাংলা একাডেমী, ১৯৯২।

রোকেয়া রচনাবলী, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত নতুন সংস্করণ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

মো: শামসুল আলম, *বেগম রোকেয়া জীবন ও সাহিত্য*, ঢাকা।

মোহাম্মদ শফিউল হাসান, *বেগম রোকেয়া সময় ও সাহিত্য*, মাওলা ব্রাদার্স, বাংলা বাজার, ঢাকা।

বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সম্মেলনে প্রদত্ত সভানেত্রীর অভিভাষণ, অগ্রন্থিত প্রবন্ধ।

সুবেহ সাদেক, অগ্রন্থিত প্রবন্ধ।

Edited by Patricia Waugh, *Literary Theory and Criticism*, Oxford University Press, first Indian edition, New Delhi, 2006.